Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 752 - 762
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অসমীয়া সংস্কৃতি ও সাহিত্যে 'মেকুরী' অথবা বিড়াল : একটি প্রতিবেদন

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম
Email ID : jyotirmoysg@pragjyotishcollege.ac.in

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Mekuri (cat), Totem & Taboo, Proverbs, Assamese Fictons, Tradition.

Abstract
'Mekuri' or cat is a welknown 'motif' belonging to various folklores and beliefs prevalent in Assam. It was the 'totem' of Chutiya. The third story in Assamese 'Saathar Vrat' is about 'Sato Mekuri'. In Assamese proverbs, Nursery Rhymes, folk tales etc. 'cat' appears with its innate powers. Again, 'mekuri' can be found in certain lexical applications and in several modern Assamese fictions. In accordance with the norms of folk culture, over time, the modern society and the cultural influence of other groups have maintained cat motif in Assamese public life. But the positive taboos have disappeared, and the negative taboos have persisted due to the influence of similar folk beliefs of other groups. Further structural analysis associated with the folklore of Assam may throw some new light. However, in Assamese rural and urban life, the cat remains as a symbol of tradition.

Discussion

আশৈশব পরিচিত পরিবেশে যে চতুষ্পদ প্রাণীটির আনাগোনা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারে একটা গোটা জনগোষ্ঠী সে হল বিড়াল বা বেড়াল, অসমে যার পরিচিত নাম 'মেকুরী' (বোড়ো ভাষায় মাঔজি বা আমিং, রাভায় মিঙ্কু)। 'বিড়াল' শব্দটিও বহুল ব্যবহৃত এবং তার স্ত্রী সংস্করণ বোঝাতে 'বিড়ালীর ব্যবহারও প্রচলিত। অবশ্য পুরুষ ও স্ত্রী বিড়ালকে যথাক্রমে 'বোন্দা' এবং 'জাঁই' নামেও অভিহিত করা হয় অসমে। এই বিড়ালকে অসমে প্রচলিত বিভিন্ন লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত 'মোটিফ' হিসাবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। কারণ সুদীর্ঘকাল এখানকার 'ওমলা' এবং 'নিচুকনি গীত' বা ঘুম পাড়ানো গান, ছড়া, লোকশব্দ, লোককথা ইত্যাদি বিভিন্ন লোক-উপাদানে 'মেকুরী' বা বিড়াল সদর্পে বিরাজমান। সেই সূত্রধরে শুধু লৌকিক ব্যবহারেই নয়, আধুনিক কালে প্রাপ্ত নানা ছড়াজাতীয় লেখা, নীতিকথামালা, গল্প, উপন্যাস আর গানেও তার সহজ আনাগোনা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অসমের সমাজ-কৃষ্টিগত (socio-cultural) কাঠামোয় বিড়ালের উপস্থিতি বহু প্রাচীন। আমরা শুরু করব আহোম রাজত্বের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে। অসম বুরঞ্জী অনুযায়ী, আহোমরাজ চুপিমফার পুত্র চুহুংমুং ওরফে দিহিঙ্গিয়া বংশের রাজা স্বর্গনারায়ণ ১৪৯৭ সালে সিংহাসন লাভ করার পর বুঢ়াগোহাঞি ও বরগোহাঞি – এই দুই শীর্ষ মন্ত্রীপদ থাকতেও বরপাত্র গোহাঞি পদটি সৃষ্টি করেন এবং প্রিয়পাত্র কনচেংকে এই পদে বসিয়ে তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যের সীমা বিস্তারে মন দেন।[১] লড়াই বাঁধে শদিয়ার 'চুটীয়া'[২] রাজা ধীরনারায়ণের সঙ্গে। হরকান্ত বরুয়া সদরামিনের লেখা 'বুরঞ্জী'তে এই সময়কার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। যুদ্ধশেষে কনচেং বরপাত্রগোহাঞি চুটীয়া রাজা ও মন্ত্রীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তাঁদের সমস্ত সম্পদ দখল করে নিয়েছিলেন। এই সম্পদের মধ্যে অন্যতম হল সোনার বিড়াল, যা যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবে স্বর্গদেও স্বর্গনারায়ণকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।[৩] 'সাতসরী অসম বুরঞ্জী'তে এই কাহিনিই সবিস্তারে লেখা আছে। এখানে অবশ্য চুটীয়া রাজা ধীরনারায়ণ নাম বদলের ফলে বীরনারায়ণ হয়েছেন। যাই হোক, কনচেং বরপাত্রগোহাঞি শদিয়া পর্যন্ত পিছু নিয়েছিলেন চুটীয়ারাজের। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা ধীরনারায়ণ দূতের হাত দিয়ে সন্ধিপ্রস্তাব পাঠান রাজার কাছে। সঙ্গে উপঢৌকন হিসাবে সোনার 'শরাই' সহ আরও অনেক কিছু। কিন্তু কনচেং রাজাও দূতের মুখে বলে পাঠালেন যে, এসব নয় 'সোনর দণ্ড, মেকুরী, খাটো আছে...' (সোনার ছত্রদণ্ড, সোনার বিড়াল ও সোনার পালঙ্ক) সেগুলোই চাই। সঙ্গত কারণেই সম্মত হলেন না চুটীয়া রাজা। কারণ সোনার 'মেকুরী' বা বিড়াল হল তাঁর 'পিতৃপিতামহর দিন সর্বস্ব' সেটা কিছুতেই দেওয়া যাবে না।[৪] যাকে বংশানুক্রমিক ভাবেই (পিতৃপিতামহর দিন) আগলে রাখতে হয় সেটা বংশের সৌভাগ্যের প্রতীক অবশ্যই। 'বুরঞ্জী'তে এই ধরনের উল্লেখ সোনার বিড়ালকে চুটীয়া রাজ্যের কূলপ্রতীক বা 'টোটেম' হবার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

অসম বুরঞ্জীরই আরেকটি বিবরণে সোনার বিড়ালের প্রসঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। সেটাও আহোমরাজ স্বর্গনারায়ণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি সিংহাসনে বসার পর দেবরাজ ইন্দ্র (আহোমরা ইন্দ্রবংশীয় রাজা বলে কথিত আছে) অধিষ্ঠাতা দেবতা 'সোমদেব'কে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে খুব সাবধানে, সম্মান সহকারে রাখতে বললেন। আর বললেন তাঁরই অংশ 'আইক্লান' - এর কাছ থেকে থাওলিপলিঙ এবং থাওবকচেঙ – এই দুজন পণ্ডিতকে যেন তিনি নিয়ে আসেন। সেভাবে স্বর্গনারায়ণ আইক্লানের কাছে গেলে তিনি ওই দুই পণ্ডিতকে তো পাঠালেনই সঙ্গে আরও অনেক জিনিস আহোমরাজকে দেন। এসবের মধ্যে ছিল 'লাপেত মেকুরী' বা সোনার বেড়াল। এই সূত্রেই বিড়াল আহোম রাজেরও কূলপ্রতীক বলে ভাবা যেতে পারে।[৫] চুটীয়া রাজারা উত্তরাধিকার সূত্রে সোনার বিড়ালকে সযত্নে রক্ষা করতেন। সৌভাগ্যের এই প্রতীককে রক্ষা করতে গিয়েই সতী সাধনী আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। সম্ভবত এদিকে লক্ষ্য রেখেই 'Significance of FELIDAE (cat family) in Chutia Culture' শীর্ষক একটি লেখায় বিড়ালকে চুটীয়া জাতির 'টোটেম' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৫ক]

বিড়ালকে জনজাতিসমূহের 'টোটেম' হিসাবে ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমত, চুটীয়া লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বিড়ালের মধ্যে পূর্বপুরুষের আত্মা বিরাজ করে এবং সে পরকালের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি মাধ্যমও বটে। প্রায় একই ধরনের লোকবিশ্বাস সোনোয়াল কছারি উপজাতিদের মধ্যেও বিরাজমান। দ্বিতীয়ত, ডিমাসা এবং বোড়োরাও মনে করেন বিড়াল হচ্ছে সম্পদ বা কুবেরের প্রতীক। তাই বিড়াল মারা, বিশেষ করে কালো বিড়াল, এই উপজাতির মানুষদের বিশ্বাস অনুযায়ী 'পাপ'। যদি কেউ মেরেও ফেলেন তবে প্রায়শ্চিত্ত করতে এঁরা দেবতার উদ্দেশ্যে একটি সোনার বিড়াল বানিয়ে দান করেন। বলা যায়, আধুনিক কালেও অসমের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এই সংস্কারকে (ট্যাবু) ধরে রেখেছেন। অসমের পল্লী ও পৌর সমাজে সোনার বিড়াল দান করাটা তাই পরিচিত প্রসঙ্গ।

কাল পরম্পরায় উত্তরাধিকারের প্রতীক হিসাবে এই বিড়াল লোককথার 'মোটিফ' হয়ে উঠল অসমীয়া জনজীবনে। লোককথা ছাড়াও, আঞ্চলিক ব্রতকথায়, প্রবাদ-প্রবচনে বা প্রাত্যহিক প্রয়োগের নানারঙ্গী কথায় 'মেকুরী' বা বিড়ালকে 'মোটিফ' হিসাবে উঠে আসতে দেখা যায়। এমনকি মানুষের স্বভাব, খাদ্যবস্তু, গাছ-লতাপাতার নামকরণে বিড়াল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির – কয়েকটি আভিধানিক প্রয়োগই তার প্রমাণ। যেমন - মেকুরী-কণীয়া (বিড়ালের মতো ছোটো কান যার। কোনো কোনো লেখায় বিশেষ কোনো চরিত্রের বর্ণনায় এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।), মেকুরী-খুজিয়া (গালের ফুসকুড়ি যা বিড়ালের পায়ের ছাপের মতো দেখতে), মেকুরী-খোজ (পা-টিপে টিপে চলার ঢঙ), মেকুরী-ঘিলা (ঝোপ ওয়ালা ছোটো গাছ), মেকুরী-ছালি (পানের সঙ্গে খাওয়ার জন্য একপ্রকার গাছের ছাল), মেকুরী-নখা (লতাজাতীয় উদ্ভিদ),

মেকুরীমাহ (আলকুশি বা বিলাইখামচি নামক একপ্রকার ডাল জাতীয় শস্য)। বিড়ালের অবয়ব, তার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার ইত্যাদি অসমীয়া প্রকৃতি পরিবেশের নামকরণে এইভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সাধারণত ব্রতসংলগ্ন 'কথা' বা কাহিনিগুলো গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করে। অসমে প্রচলিত ব্রতকথাগুলো তার ব্যতিক্রম নয়। কামাখ্যা দেবালয় এবং নলবারী, বামুন্দি, হাজো আর শুয়ালকুচি প্রভৃতি অঞ্চলে বিবাহিতা, সন্তানবতী উচ্চবর্ণের মহিলারা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের সাত দিন 'সাথার ব্রত' বা 'সাথা বরত' পালন করেন। সাত দিনে সাতটি ব্রতকথা বা কাহিনি শোনানো হয় ব্রতিনীদের। এর তৃতীয় কাহিনিটি হল 'সাতো মেকুরী'র অর্থাৎ সাতো নাম্নী একটি বিড়ালের। কাহিনির মূল নির্যাস হল, একজন নারী শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারিণী হতে পারেন কিন্তু তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র রমণী হিসাবে বিবেচিত হবেন না যতক্ষণ না পঞ্চমাতৃকার প্রতি পরম শ্রদ্ধাভক্তি স্থাপন করতে পারছেন। সেটা অর্জন করার জন্যই তাঁকে নিয়মিত শুদ্ধভাবে এবং শুদ্ধ চিত্তে 'সাত বরত' পালন করতে হবে।[৬] কাহিনিটি একটি সদগুণসম্পন্ন বিড়াল 'সাতো'কে কেন্দ্র করে। এক ব্যবসায়ী স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে সুখে ছিলেন। এই বাড়িতেই সাতো থাকত। পরিবারের সুখ, সমৃদ্ধি তার জন্যই বজায় ছিল। পুত্রবধূটি লোভে পড়ে একদিন শ্বশুরের এনে দেওয়া সাতটি 'লাছিম' মাছ (বৈজ্ঞানিক নাম Cirrhinus reba, বাটামাছ) একাই ভেজে খেয়ে ফেলেছিল আর চুরি করে খাবার দায়টা ঠেলে দিয়েছিল বিড়াল সাতোর দিকে। পঞ্চমাতৃকা এতে ক্ষুব্ধ হন এবং পুত্রবধূটির পাঁচটি পুত্র সন্তানকে জন্মের পরই তাঁদের কাছে নিয়ে যান। লোকেরা বলাবলি করে যে, ওই মহিলা নিজের সন্তানকে খেয়ে ফেলেছে। এভাবে ছয় নম্বর পুত্র সন্তানের জন্ম এবং তার অন্নপ্রাশনের দিন উপস্থিত হলে পঞ্চমাতৃকা বণিকের বাড়িতে গিয়ে সব কথা খুলে বলেন। সাতোর চিন্তায় কাতর বণিককে তাঁরা আশ্বাস দেন এই বলে যে, পুত্রবধূটি যদি নিয়ম করে সাত-ব্রত পালন করে তবে 'সাতো' এই পরিবারে আবার ফিরে আসবে।[৭] বিড়াল এখানে সংসারের সৌভাগ্যের প্রতীক, যার সঙ্গে উর্বরা শক্তির যোগ আছে (তুলনীয় বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যত্র প্রচলিত ষষ্ঠীব্রত)। একমাত্র বিবাহিত সন্তানবতী নারী ছাড়া এই কাহিনি আর কেউ বলবার অধিকারী নন – এমনটাই অসমীয়া সমাজে প্রচলিত। সংগ্রাহক অধ্যাপক নবীনচন্দ্র শর্মাকে কাহিনিটি বলেছিলেন নীলাচলের শ্রীযুতা বাসন্তী দেবী। প্রায় একই ধরনের আরেকটি ব্রতকাহিনি 'সুখর মুখ' সংগ্রহ করেছিলেন অধ্যাপক প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী। তাঁর 'ব্যালাডস অ্যান্ড টেলস অফ আসাম' গ্রন্থে চন্দ্রমুখী কথিত এই কাহিনিটি সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। এই সাত-ব্রতটি এখনও পালিত হয়। সুতরাং চুটীয়ারাজবংশ বা আহোম দিহিঙ্গিয়া রাজবংশের মতোই লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সূত্রে অসমীয়া বর্ণহিন্দু সমাজে 'বিড়াল' আজও সৌভাগ্যের প্রতীক।

অসমীয়া প্রবচনে বিড়ালকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই যে ব্রতকথাটির সম্বন্ধে বললাম, প্রাসঙ্গিক বোধে এই প্রবচনটির উল্লেখ করা যাবে, - 'ঘৈণীয়ে মাছ খায় বোন্দার মরণ'। একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো অর্থে এই প্রবচনটি ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ – পত্নী মাছ খায় কিন্তু দোষ পড়ে হুলো বিড়ালের ওপর। বিড়ালকে নিয়ে তৈরি অসমীয়া প্রবচনের দিকে আরও একটু তাকানো যাক। বিড়ালকে অসমেও 'বাঘের মাসি' বলে। সেই প্রসঙ্গেই একটি প্রবচন এরকম, - 'বাঘ চাব খুজিলে বিড়ালীকে চাবা।

বর মানুহ চাবলৈ আলিবাটলৈ যাবা।' – অর্থাৎ বাঘের স্বভাব, চালচলন ইত্যাদি সম্পর্কে যদি জানতে হয় তাহলে বিড়ালকে দেখলেই হবে। তেমনই গ্রামের রাস্তাতেই বড়োঘরের লোভী সুযোগ সন্ধানীদের আনাগোনা। অনেকে আবার এভাবেও বলেন, - 'বিড়ালী চালে বাঘ চাব নালাগে'। বাঘের সঙ্গে বিড়ালের অনেক কিছুতেই মিল – শুধু চেহারায় নয় কাজেকর্মেও। বিজ্ঞান বলে, প্রাণী দুটির ডি.এন.এ-তে ৯৫.৬% মিল। কিন্তু এই ডি.এন.এ-র ব্যাপারটা না জানলেও গ্রাম-অসমের বিজ্ঞজনেরা এদেরকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকেই এমন একটি লোকবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছেন। তবে এই প্রবচনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ। এমন দুজন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত লোক, যাদের মধ্যে একজনের স্বভাব দেখেই অন্যজন কেমন হবে তা আন্দাজ করে নেওয়া যায় – এই বিশ্বাস থেকেই অসমীয়া সমাজে প্রবচনটির উৎপত্তি, মাধ্যম হয়েছে 'বিড়াল'। এর পরের প্রবচনটি হল, 'খাই দাই বোন্দা আঁতর'। অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়ার পর বিড়াল নিঃশব্দে দূরে সরে যায়। এটা তেমন লোকদের লক্ষ্য করে বলা যারা চালাকি করে শুধু বেড়ে দেওয়া খাবার খেয়েই সরে পড়ে, কোনো প্রতিদান দেয় না। এই ধরনের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুবিধেবাদী মানুষদের চিনিয়ে দিতেই এই প্রবচন। মানুষের এরকম সুবিধেবাদী চরিত্র বিড়ালের প্রতীকে আরও কয়েকটি অসমীয়া প্রবচনে ধরা পড়ে। যেমন, –

‘কঁকাল ভগা বিড়ালী গোসাই ঘরত শোয়ে
গোন্ধোয়া মুখখন গাখীরেদি ধোয়ে।’

নিছক গদ্যে এর ভাষ্য – যে বিড়াল কোমর ভাঙার অজুহাতে পবিত্র মন্দিরে ঘুমোতে যায়, সে-ই তার এঁটো মুখ দুধ দিয়ে ধোয়। অর্থাৎ যে লোকটি সুযোগের ব্যবহার করে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়, সে আবার সবার সামনে ভালো মানুষ সাজে। আবার আরেকটি প্রবচনে আছে, –

‘হাপাই আনে তিরি
বোন্দা ওপরতে গিরি।’

– হাপা (বনবিড়াল) বিয়ে করে ঘরে বউ নিয়ে এলো আর হুলো বিড়াল তার বিয়ে করা বউএর ওপর সর্দারি শুরু করল। এর লক্ষ্য এমন লোক যারা অন্যের উপার্জনের ওপর বসে খায়।[৮] লক্ষণীয়, পল্লীবিশ্বাসে বিড়াল প্রায় সব প্রবচনেই সুযোগসন্ধানী ও একটি ঋণাত্মক (restrictive) ট্যাবু।

এই মন্তব্যটি সুপ্রমাণিত এ-জন্য যে, অসমীয়া প্রবচনে ‘বিড়ালী ব্রত’, ‘ভিজা মেকুরী’, ‘জোলোঙার মেকুরী ওলোয়া’ ইত্যাদি খণ্ডবাক্যগুলো সহজলভ্য। তুলনাবাচক শব্দ হিসাবে আমাদের মনে পড়তে পারে ‘বিড়াল তপস্বী’, ‘ভেজা বেড়াল’, ‘ঝুলি থেকে বেড়াল বার হওয়া’ ইত্যাদি বাংলা প্রবচন বা বাগধারাগুলো। যে ধার্মিক সাজে অথচ অন্যায় কাজ করা থেকে কিছুতেই বিরত থাকতে পারে না, সে-ই বিড়াল তপস্বী বা সেধরনের আচরণই ‘বিড়ালী ব্রত’। ধূর্ত লোক যখন নিরীহ চেহারা ধারণ করে তখনই সে ‘ভিজা মেকুরী’। অসৎ উদ্দেশ্যটা যখন সর্বসমক্ষে প্রকাশ পায় তখনই ‘ঝুলি থেকে বিড়াল বেরোয়’ (জোলোঙার মেকুরী ওলোয়া)। ঝুলি থেকে বিড়াল বার হবার উৎস হিসাবে কেউ কেউ বলে থাকেন, অনেকদিন আগে কেউ শুয়োরের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে তাদের বস্তায় ভরে, জঞ্জাল ফেলার জায়গায় নিয়ে যান। সেখানে বস্তার মুখ খুলতেই একটা বিড়াল বেরিয়ে আসে। সেখান থেকেই অসমীয়া বাগধারাটি তৈরি হয়েছে। লোকবিশ্বাসে ‘শুয়োর’ আর ‘বিড়াল’ দুটোই ঋণাত্মক ট্যাবু – দুটোরই সহাবস্থান লোকসাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে একটি অনুসন্ধিৎসার জন্ম দেয় না কি?

‘শ্রাদ্ধত মেকুরী বান্ধা’ – শ্রাদ্ধবাসরে বিড়ালকে বেঁধে রাখা একটি অসমীয়া প্রবচন, তবু এর উৎপত্তি একটি লোকবিশ্বাস। সম্ভবত শ্রাদ্ধের জন্য তৈরি খাবারে যাতে মুখ দিতে না পারে সেজন্য বিড়ালকে বেঁধে রাখা হত। তা থেকে প্রবচনটির জন্ম। অযৌক্তিক সামাজিক রীতিনীতিকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায় না - এটা বিড়ালকে খাবার খেতে না দিয়ে বেঁধে রাখার মতোই ঠুনকো ব্যবস্থা। এই অর্থেই প্রবচনটি ব্যবহৃত হয়।[৯]

এই প্রসঙ্গে আরেকটি লোকবিশ্বাসের কথা বলে নিই। বিড়াল প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে ভারতী গগৈ বরুয়া ‘মেকুরী’ (বিড়াল) প্রবন্ধে বলেছেন পল্লী অঞ্চলের একটি সংস্কারের কথা। কারও বাড়িতে যদি পোষা বিড়াল থাকে আর নবজাতকেরও আগমন ঘটে, তবে সেই নবজাতককে মাটিতে বা মাদুর বা চাটাই পেতে শরীর ভালো করে ঢেকে অথবা ছাতার মতো কোনো আচ্ছাদনের নিচে শুইয়ে রাখা হয়। অথবা বিড়ালকে বেঁধে রাখা হয়। নাহলে নাকি ঈর্ষাবশত পোষা বিড়ালটি নবজাতক শিশুটিকে আঁচড়ে বা কামড়ে দিতে পারে।[১০] অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে এভাবে বিড়ালকেন্দ্রিক আরও কিছু লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। যেমন নলবারী অঞ্চলের লোকেদের বিশ্বাস সকালবেলা বিড়াল যদি বারান্দায় বসে বারবার সামনের দুই পা দিয়ে নিজের মুখ ঘষে তবে বাড়িতে অতিথি আসে। আবার এটাও কথিত আছে রাতে বাড়ির পোষা বিড়াল কাঁদলে খুব শিগগিরই কোনো অমঙ্গল ঘটবে। ওই অঞ্চলে আরেকটি লোকবিশ্বাস হলো, কোনো মানুষের পায়ের তলা দিয়ে কালো বিড়াল চলে গেলে তার মৃত্যু আসন্ন (তথ্যদাতা জুরি শর্মা)। এর পাশাপাশি উজান অসমের গ্রামজীবনে ‘পহু শিকার’ বলে একটি রসাল কথা প্রচলিত আছে। ‘মেটিং সজিন’এ রাস্তার হুলো বিড়াল যখন আদরের গৃহপালিত মেনিটিকে গর্ভবতী করে তখন সেটা হরিণ শিকারের (পহু চিকার) সমতুল্য। আর পৌরজীবনে সেটাই একটা রসাল সাঙ্কেতিক শব্দ। অঞ্চল বিশেষে হলেও আধুনিক নরনারীর গোপন মিলনে বিড়াল এভাবে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[১০ক]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 752 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অসমীয়া ‘ওমলা গীত’ (Nursery Rhymes) বা ছেলেভুলানো ছড়ায় ড. নির্মলপ্রভা বরদলৈ লিখেছেন, - ‘মেকুরী আহ আহ/ মিউ মিউ মিউ/ গাখীর আছে, মাছ আছে/ আরু আছে ঘিঁউ।’ অসমীয়া লোকসাহিত্যের এই পর্যায়ে বিড়ালের উপস্থিতি যথেষ্ট। অসমীয়া গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে বিড়াল সম্বন্ধীয় একটি ছড়া বা প্রবাদ বাক্য (‘ফকরা যোজনা’ বা ‘ওমলা গীত’ হতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে) এক্ষেত্রে বেশ জনপ্রিয়। উজান ও ভাটিভেদে তার পাঠভেদও পাওয়া যায়। ছড়াটি উল্লেখ করি –

‘বর ঘরর মেকুরী সরুঘরলৈ যায়
ঢাকন পেলাই পঁইতাভাত, পোড়া মাছ চুর করি খায়।’
এর ভাবানুবাদ বা আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় –
‘ধনীর ঘরের বিড়াল গরিবের বাড়ি যায়
ঢাকনা ফেলে পান্তাভাত, মাছপোড়া চুরি করে খায়।’

কিন্তু ব্যঞ্জনার্থ হল, সমাজের উঁচুতলার লোকেরা বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সুযোগের ব্যবহার করে চুপিচুপি গরিব মানুষগুলোর অন্দরমহলে ঢোকে এবং ঘরের আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। ছড়াটির এই পাঠ উজান অসমে সহজলভ্য। কিন্তু কামরূপ, রঙিয়া, নলবারী ইত্যাদি অঞ্চলে এই ছড়াটির পাঠভেদ এরকম, -

‘বর ঘরর মেকুরী সরুঘরলৈ যায়
ভজা মাছর চরু ঢাকন মেলি চায়।’ (তথ্য দাতা বৈকুণ্ঠ রাজবংশী)

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিটি বদলে গেছে। পান্তাভাত আর পোড়া মাছের বদলে এসেছে ভাজা মাছ। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল কড়াই বা পাত্রের ঢাকনি ফেলে দিয়ে খাবার পরিবর্তে বিড়াল এখানে ঢাকনিটা খুলে দেখছে, ফেলছে না বা খাচ্ছেও না। তৃতীয় আরেকটি পাঠ আছে বরপেটা, ধুবড়ি অঞ্চলে, -

‘বর ঘরর মেকুরী সরুঘরলৈ যায়
কলিয়ার মেকুরী নুনেভাতে খায়।’ (তথ্য দাতা অভিজিৎ কুমার দত্ত)

‘কলিয়া’ হল কালাপানি বা দ্বীপান্তরের ব্যক্তি, অতয়েব সে অপাংক্তেয়। তার কপালে জোটে নুনভাত, ‘নিমখ’ শব্দটি কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হয়নি। পয়সাওয়ালা লোক বা অপরিচিত ব্যক্তি – যে-ই হোক না কেন, সে গরিবের ঘরে এলে নুনভাতই খাবে। কামরূপ হোক বা বরপেটা – দুটি পাঠভেদ কিন্তু শিশু মনোরঞ্জনের জন্য ‘ওমলা গীত’ বা ছড়া হিসাবেই বহু ব্যবহৃত। তাছাড়া সামাজিক ব্যবহারের পার্থক্যটাও এখানে লক্ষণীয়। কখনও মাছ পোড়া আবার কখনও মাছ ভাজা অথবা কড়াইয়ের ঢাকনি ফেলে দেওয়া বা তুলে দেখা হচ্ছে দীর্ঘলালিত ও প্রচলিত পারিবারিক তথা সামাজিক ব্যবহারের প্রতিচ্ছবি। প্রখ্যাত অভিনেত্রী আইমি বরুয়ার একটি ‘ওমলা গীত’-এর ভিডিওতে এর আরেকটি পাঠভেদও পাওয়া যায়, - ‘বড় ঘরর মেকুরী সরুঘরলৈ যায়/ ঢাকন দাঙি পঁইতা ভাত/ পোরা মাছ চুর করি খায়/ ভা-কুতকুত, ভা-কুতকুত।’ এখানে আবার কড়াইয়ের ঢাকনিটা ‘তুলে’ (দাঙি) দেখছে বিড়াল। শিশুকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসানোর জন্য বাংলাতেও সোনামনির ঘরে বিড়াল আসার এরকম খেলা অনেক মা-ই খেলে থাকেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ছড়াটি একটি আধুনিক অসমীয়া গানের উৎসও। শ্রদ্ধেয় খগেন মহন্ত গাইবেন বলে আরেকজন প্রথিতযশা লেখক তথা তাঁর আত্মীয় কেশব মহন্ত লিখলেন, - ‘বরঘরর মেকুরী সরু ঘরলৈ যায়/ সরুঘরর মানুহবোরে চুকত চিনি পায়/ সহজ সহজ মানুহবোরে খোজত চিনি পায়।’ এখানে ‘মেকুরী’ বা বিড়ালটি হতে পারে একজন বিবাহিতা মহিলা। তিনি যখন গ্রামে এলেন কারও পুত্রবধূ হয়ে, তখন গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলো তার চলন-বলনেই বুঝতে পারে যে সে বড়ো লোকের মেয়ে। আরেকটি অর্থ এবং যেটা প্রচলিত লোক-মানসিকতার সঙ্গে এই প্রবচনের মাটির

যোগ স্থাপন করে, তা হল – গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের বাড়িতে উঁচুতলার লোকেদের সন্দেহজনক আনাগোনা যার কারণ সহজ সরল মানুষগুলোর বুঝতে বাকি থাকে না। দুটো ক্ষেত্রেই 'বিড়াল'রূপী বড়ো মানুষের ঋণাত্মক ক্রিয়াশীলতা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। অসমের পল্লীজীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় কেশব মহন্তর গান ও কবিতার কথাকে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছিল। অসমীয়া পল্লীসমাজ, নানা লোকব্যবহার ও লোক-মানসিকতা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নমুনা এই গানটি। এই যে একই প্রসঙ্গের নানামুখী পরিবর্তন সেটাকে আমরা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'variables'এর নমুনা হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। শুধু লোককথা নয়, লোকবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত কাহিনি বা প্রবাদ-প্রবচন সংলগ্ন কাহিনিও পরিভ্রমণ করে। অর্থাৎ একজায়গা থেকে আরও এক জায়গায়, একমুখ থেকে শতমুখে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মূল কাঠামোটা বা অন্তর্গত চরিত্রের ক্রিয়াশীলতা (function) স্থির (constant) থাকলেও কার্যের (action) পরিবর্তন হয়।[১০খ] এখানেও 'বিড়াল' চরিত্রের স্বরূপ কিন্তু স্থির। সে সুযোগসন্ধানী, সে লোভী – পরের, বিশেষ করে গরিবঘরের অন্দরমহলের দিকে তার নজর। যেন সে-ই 'ছোঁই ছোঁই যাইসি বাক্ষ নাড়িয়া'। দূর-দূরান্তের সংযোগ কি এখানে দেখা যাচ্ছে না?

অসমীয়া লোককথা বা নীতিকথা অর্থাৎ 'সাধুকথা' গুলোতে[১১] 'বিড়াল' তার সহজাত ক্ষমতা নিয়ে হাজির। বিড়ালের নানা স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই লোককথাগুলো রচিত হয়েছে। কিছু আছে সংগৃহীত এবং নতুনভাবে রচিত আর কিছু আছে অনূদিত। প্রথম ধরনের লোককথা রচনায় লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর 'বুঢ়ী আইর সাধু' বা বুড়িমার গল্পকথা এক্ষেত্রে অনন্য। এর সঙ্গে আছে 'সাধুকথার কুকি', বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদে একে বলা যেতে পারে 'নীতিকথার ঝুড়ি'। এছাড়া ঈশপের গল্প, তেনালিরামার গল্প অসমিয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'বুঢ়ী আইর সাধু' বইতে বিড়াল চরিত্র আছে 'মেকুরীর জীয়েকর সাধু' বা বিড়ালের মেয়ের গল্পটিতে। সেখানে সন্তানসম্ভবা বিড়ালটি তার মালকিনের কাছে ভাজা মাছ খাবার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিল। মালকিনও তখন সন্তানসম্ভবা। সে বিড়ালকে মাছ যোগাড় করে আনার পরামর্শ দেয়। বিড়াল এর বাড়ি ওর বাড়ি থেকে মাছ এনে দিতে শুরু করল। কিন্তু বদলে জুটল শুধু কাঁটা, মাছগুলো মালকিনই খেয়ে ফেলত। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিড়াল মালকিনকে শাপ দিল – 'তোর পেটেরটা আমার পেটে আর আমার পেটেরটা তোর পেটে যাক।' ফলে বিড়ালের হল দুটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান আর মালকিনের কোলে এলো দুটো বিড়ালছানা। 'সাধুকথার কুকি'তে সামান্য বিড়াল প্রসঙ্গ আছে 'পণ্ডিতমশাই' গল্পটিতে। কিন্তু 'বরাগী মেকুরী' বা 'বিড়াল তপস্বী' গল্পে বিড়ালের নেতিবাচক স্বভাবের গল্প আছে। এই গল্পে বিড়াল প্রথমে ভক্তপ্রাণ লোক হিসাবে শালিক-কবুতর ইত্যাদি পাখিদের নিয়ে বৃন্দাবনের দিকে রওনা দেয়। মুখে তার সবসময় কৃষ্ণনাম। পাখিরা তার আচরণে বিশ্বাস করে সঙ্গী হয়। কিন্তু রাস্তায় বিশ্রাম নেবার ছলে বিড়ালটি পাখিদের এক এক করে খেয়ে ফেলে।

নগাঁওর মাথন ভূঞা শিশুপাঠ্য দুটি 'সাধুকথা'র বই লিখেছেন – 'কন মইনার সাধু' আর 'জোনবাইর দেশর সাধু'। দ্বিতীয় বইতে দুটি কাহিনি আছে বিড়ালকে নিয়ে। সেখানে ছোটো মেয়ে আর তার আদরের বিড়ালের স্নেহের সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে যা বড়োদের আচরণে প্রভাব ফেলতে পারে। গল্পদুটির একটি 'মিলির মরম' (মিলির ভালোবাসা) আর অন্যটি 'চন্দ্রমুখীর কাহিনী'। মিলি আর চন্দ্রমুখী দুটি দুই গল্পের বিড়াল। প্রথমটিতে কুকি নামনী মেয়েটির সৎ-মা হিংসাবশত মিলিকে কুকির অজান্তে বস্তায় ভরে নদীর ওপারে রেকেহ আসে। কিন্তু কিছুদিন পর কুকির স্নেহের টানে মিলি একটি কচ্ছপের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তার পিঠে চড়ে নদী পার হয় ও এক দৌড়ে কুকির কাছে চলে আসে। এটা দেখে কুকির সৎ-মায়ের ভুল ভাঙে, তিনি কুকিকে নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসতে শুরু করেন। এরকমই মানবতার গল্প 'চন্দ্রমুখীর কাহিনী'। সেখানে চন্দ্রমুখী মুমুর আদরের বিড়াল। মুমুর বান্ধবীর চিম্পির খুব শখ – তারও ওরকম একটি বিড়াল চাই। চিম্পির মায়ের মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। সুযোগ বুঝে মুমুর বিড়ালটিকেই তিনি চুরি করে চিম্পিকে এনে দিলেন। চিম্পি প্রথমে একটু আপত্তি করলেও মুমুর বিড়ালটিকেই নিজের বলে ভাবতে শুরু করল আর তার সঙ্গে খেলাধুলা করতে শুরু করল। কিন্তু চন্দ্রমুখীর তাতে মন নেই। সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। মুমুও ওদিকে মনমরা। চিম্পির জন্মদিনে মুমু গেল তাদের বাড়িতে আর অমনি চন্দ্রমুখী লাফিয়ে চলে গেল মুমুর কাছে। তখন সব পরিষ্কার হল মুমুর কাছে। ওদিকে চিম্পির মা চন্দ্রমুখীর আঁচড়ে আহত হয়ে হাসপাতালে গেলেন।[১২] দুটো গল্পেই মানুষ ও প্রাণীর পরিবাশগত সম্পর্ককে

দেখানো হয়েছে। এরকম আরেকটি মানবীয় সম্পর্কের গল্প অসম জাতীয় বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির অসমীয়া ভাষা শিক্ষার বইতে 'পখীর মেকুরী পোয়ালি' শীর্ষক একটি নীতিশিক্ষামূলক পাঠে আছে।

আরেকজন অসমীয়া শিশুসাহিত্য লেখক রত্নেশ্বর বরা 'দৈনিক অসম' পত্রিকায় 'নিগনি আরু মেকুরী' অর্থাৎ 'ইঁদুর ও বিড়াল' শীর্ষক একটি 'সাধুকথা' লিখেছিলেন, পরে তা একটি বইতে সংকলিত হয়। নীতিকথা জাতীয় এই গল্পে শিকারির জালে ধরা পড়া একটি বিড়ালকে ইঁদুর তাকে না-খাওয়া এবং অন্যান্যদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার শর্তে জাল কেটে মুক্ত করেছিল। মুক্তি পাবার পর বহুদিন বিড়াল তার শর্ত পালন করেছে। কিন্তু একদিন তার বাচ্চাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে ইঁদুরকে তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে। ইঁদুর তার মতলব বুঝতে পেরে বিড়ালের সম্পর্ক ছেড়ে চলে যায়।[১৩] তবে এই জাল কেটে শক্তিমান শত্রুকে মুক্ত করার গল্প ঈশপের কাহিনিতে আছে এবং অসমীয়াতে তা অনূদিত হয়েছে। সেই গল্পটি হল 'সিংহ ও ইঁদুর'। 'ঈশপের গল্প' থেকে বিড়াল সম্পর্কিত প্রায় সব গল্প অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তালিকায় থাকবে বিখ্যাত 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে' প্রবাদের উৎস গল্প 'মেকুরীর ডিঙিত টিলিঙা', বাঁদরের পিঠেভাগের পরিচিত গল্প 'দুটা মূৰ্খ মেকুরী' (দুই মূর্খ বিড়াল) ইত্যাদি। পঞ্চতন্ত্রের সেই বিখ্যাত মুনি ও ইঁদুরের কথা নিয়ে রচিত 'পুনর্মূষিকভব' গল্পটিও অসমিয়াতে অনূদিত হয়েছে। আর আছে দক্ষিণের তেনালিরামার গল্প যা অসমীয়াতে অনূদিত হয়েছে, ছোটোদের জন্য ইউ টিউব ভিডিও তৈরি করাও হয়েছে। বিড়াল নিয়ে লেখা তেমনই একটি গল্প 'গাখীর নোখোয়া মেকুরী' অর্থাৎ যে বিড়াল দুধ খায় না। এটিও নীতিকথা মূলক গল্প যেখানে বক্তব্য হল, আরামই কষ্টের মূল, পরিশ্রমে কাজের সাফল্য আসে। গল্পটিতে তেনালিরাম রাজ্যে ইঁদুরের উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় রাজার আদেশে অন্যান্য সবার মতোই বিড়াল পুষতে শুরু করেছিল। রাজ-ব্যবস্থায় বিড়ালগুলোর জন্য বরাদ্দ ছিল খাঁটি দুধ। সেই দুধ খেয়ে সবার বিড়াল মোটা আর অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। তেনালি তখন উপায় বার করে নিজের বিড়ালকে গরম দুধ দেওয়া শুরু করল। বিড়াল তখন আয়েশ করা ছেড়ে গরম দুধ খাবার চেয়ে ইঁদুর মেরে খাওয়াই ভালো মনে করল। একদিন রাজা যখন বিড়ালদের অবস্থা দেখতে চাইলেন তখন তেনালি প্রমাণ করে দিল যে তার বিড়াল সবচেয়ে ভালো, কারণ সে দুধ খায় না।[১৪]

অসমের কছারি, বোড়ো, রাভা ইত্যাদি উপজাতি মানুষের সংস্কৃতিতেও বিড়ালকে নিয়ে কিছু জনপ্রিয় কাহিনি প্রচলিত। রাভাদের মধ্যে জনপ্রিয় বাঘ আর বিড়ালের ঝগড়ার কাহিনিটি বেশ মজার। একদিন বাঘ আর বিড়াল মিলে একটা হরিণ শিকার করে আনল। বিড়াল সেটা রান্না করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে বাঘ তাকে কোনো লোকের বাড়ি থেকে আগুন নিয়ে আসতে বলল। বিড়াল আগুন আনতে গিয়ে সেখানে পোড়া মাছ পেয়ে আর ফিরল না। রাগে বাঘ গরগর করতে লাগল। এই ব্যাপার দেখে বিড়াল নিজের বিষ্ঠাটাও মাটিচাপা দিয়ে চিহ্ন মুছে ফেলল যাতে বাঘ তাকে খুঁজে না পায়। সেই থেকে বাঘের মাসি হয়ে গেল চরম শত্রু।[১৫]

হাফলঙের বিআতে (Biate) উপজাতিদের মধ্যেও বিড়ালের উপকথা প্রচলিত আছে। এরকম একটি কাহিনিতে একবার বিড়ালের সঙ্গে মুরগির বন্ধুত্ব হয়। বিড়াল তার বাড়িতে যেতে চায়। মুরগি বিড়ালের বদ মতলবের কথা আন্দাজ করে ছানাপোনাদের নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। কিন্তু বিড়ালকে বাড়িতে আসতে বলে দেয়। বিড়াল তাদের বাড়িতে না পেয়ে ফিরে আসে। পরদিন আবার মুরগি তাকে কথা দেয় যে রাতে আগুনের পাশেই তারা থাকবে বিড়ালের অপেক্ষায়। কিন্তু সেরাতেও বিড়াল তাদের পায় না। তবে সুযোগ এসে যায় এক রাতে। বিড়াল মুরগি আর তার বাচ্চাদের খেতে উদ্যত হলে মুরগিটি তাকে দুটি ডিম এগিয়ে দিয়ে বাচ্চাদের ছেড়ে দিতে বলে। বিড়াল ডিম দুটো আগুনে সেদ্ধ করে দিতে বলে মুরগিকে। সেই মতো সেগুলো আগুনে দেওয়া হল। আগুনের আঁচে ডিম ফেটে বিড়ালের চোখ অন্ধ হয়ে গেল। সে অপকর্মের শাস্তি পেল।[১৬]

আধুনিক অসমীয়া কথাসাহিত্যের দিকে তাকালে বেশ কিছু লেখায় বিড়াল প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। 'সধয়াপুরর সোনর মেকুরী' উপন্যাসের বিষয় আহোমের হাতে চুটিয়া রাজ্যের পতন। আগে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এই উপন্যাসে কুবেরের কাছ থেকে সম্পদ হিসাবে চুটিয়াদের সোনার বিড়াল লাভের প্রসঙ্গ আছে।[১৭] সাহিত্য ডট অর্গ-এর দ্বাদশ বর্ষ দশম সংখ্যায় (২০২৩) অনামিকা বরুয়া উপন্যাসটির একটি আলোচনা করেছেন। প্রবীণা শইকিয়ার 'অবিনাশী স্বপ্ন' গল্পে একটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে কালো বিড়াল এসে দেখা দিয়েছিল। দিবাকর নাটকে রামচন্দ্র সেজেছিলেন;

সীতারূপী রমেশ তাকে মালা দিয়ে বরণ করতে এলে তিনি রমেশের চোখের তারায় কালো বিড়ালের সর্বনাশী দৃষ্টি দেখতে পান।[১৮] আরেকজন গল্পকার অপু ভরদ্বাজ 'কথায় কথায়' শিরোনামে একটি গল্প লিখেছেন। এখানে 'মেকুরী চাং' জায়গাটার নামকরণ কীভাবে হল সেই বৃত্তান্ত আছে। ভাঙের নেশায় বুঁদ হয়ে দঞি গাম নামে এক ব্যক্তি এক পোড়ো বাড়িতে অনেকগুলো লোমওয়ালা বিড়াল দেখার গল্প ফেঁদে বসেছিল বন্ধুর কাছে। সেই গল্পই নানা জনের সারজল পেয়ে এমন দাঁড়াল যে দঞির বিড়ালগুলো মায়াবী, তান্ত্রিকের সেবা করার জন্য যম এদের পাঠিয়েছিল। তান্ত্রিক মরার পর সেগুলো আবার পাতালে চলে গেছে। এভাবেই দঞির চাংঘরের (মাটি থেকে অল্প উঁচুতে তৈরি বাড়ি) বিড়াল লোককথার ভিতর দিয়ে স্থাননামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।[১৯] সুলেখক ভূপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য 'সাতসরী' পত্রিকার ২০১৩-র এপ্রিল সংখ্যায় 'বজারত এইজনী কার মেকুরী?' শীর্ষক একটি গল্প লিখেছিলেন। রাস্তার একটি বিড়ালকে দেখে কয়েকজন বন্ধুর কথপকথনে গল্পটি দানা বেঁধেছে। এখানে বিড়াল আর ঠানুদের প্রেমিকা রাম্না সমার্থক হয়ে গেছে। এরকম ভাবে বেশ কিছু গল্পেই 'বিড়াল'কে প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এখন এই সময় ডিজিটাল মাধ্যমের সাহিত্য আলোচনাতেও বিড়াল ব্রাত্য নয়। অসমীয়াত কথাবতরা, সাহিত্য ডট অর্গ, নীলাচরাই ইত্যাদি ই-ম্যাগাজিন বা সামাজিক মাধ্যমগুলোতে বিড়াল সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখা পাওয়া যায়। ২০১৮-তে 'অসমীয়াত কথাবতরা'র ফেসবুক পাতায় রশিদা রহমান বিড়াল নিয়ে তাঁর একটি অভিজ্ঞতা পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা বিড়াল পুষতেন, একে একে এগারোটা হয়েছিল সবগুলোর নাম ছিল আলাদা আলাদা – বগেরা, মুগা, কলি, শ্বেরু ইত্যাদি। সারাদিন এদের পিছনেই সময় কাটত। তবে লেখিকার ছোট্ট মেয়েটি একদিন একটি বিড়ালের লেজ ধরে টানায় সে আঁচড়ে দিয়েছিল। এরপর থেকে তাঁদের বিড়ালপ্রীতি আর আগের মতো থাকেনি। একই বছরে অন্য একটি লেখায় মাধুরী গগৈ জানিয়েছিলেন বাড়ির বিড়াল – সে সাদা হোক, কালো হোক, যেরকমই হোক – তাকে ভালোবাসার কথা। বিশেষ করে কালো বিড়াল সম্বন্ধে তাঁর অনুভবের কথা ব্যক্ত করেছেন পাঠক-পাঠিকার কাছে। কালো বিড়াল কেউ নিতে চায় না, সবাই সাদা বা বাদামি অথবা সাদা-বাদামিতে মেশানো রঙের বিড়ালই পছন্দ করে। মাধুরী দেবীর বাড়িতে একদিন এসে আশ্রয় নেয় সন্তানসম্ভবা মেনি বিড়াল। চারচারটে সন্তানের জন্মও হয় – এর দুটো কালো। মা তার একটি কালো বিড়াল নিয়ে একদিন কোথায় যেন চলে যায় রয়ে যায় অন্য কালোটি - 'মিমি'। লেখিকা ভেবে পান না, অমন সাদা মা-বিড়ালের সন্তান কেন কালো হল। একদিন একটি কালো হুলো এসে মিমির পাশে বসল, তাকে আদরও করল, সঙ্গে করে নিয়েও গেল। তখন বোঝা গেল মিমির কালো চেহারার রহস্য। মিমির বাবাটি কিন্তু সহজে লোকসমক্ষে আসে না, পালিয়ে বেড়ায়, চোখেমুখে একটু ভয়-ভয় ভাব। এটা দেখে লেখিকা একটি অসমীয়া প্রবচনের আদলে কবিতা লেখেন, - 'ফটা হওক চিটা হওক পাটর টঙালি/ ক'লী হওক মলী হওক মিমি আমার মেকুরী।' ছেঁড়া হলেও পট্টবস্ত্র যেমন মূল্যবান তেমনই কালো হলেও মিমি বিড়াল লেখিকার একান্ত আপন।[২০] সাহিত্য ডট অর্গ-এর পাতায় আর্নেস্ট হেমিঙওয়ের 'ক্যাট ইন দ্য রেইন' গল্পটির অনুবাদ করেছেন নাজমা বেগম (দ্বাদশ বর্ষ, নবম সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩)। এখানে আমেরিকান দম্পতীর বিড়ালপ্রীতি ও বর্ষণসিক্ত দিনে হোটেল ম্যানেজারের সহানুভূতির ছবি আছে। আধুনিক শিক্ষিত মানুষের মনে বিড়াল সম্বন্ধে কিছু অপধারণা আছে। যেমন বিড়াল রাস্তা কাটলে অমঙ্গল হয়। নীলাচরাই নামে একটি আন্তর্জাল পত্রিকায় সুশান্তকৃষ্ণ শর্মা এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন (১১ জুলাই, ২০১৮) 'বরঘরর মেকুরী সরুঘরলৈ গ'লেই যেনিবা, তাতেনো কি অমঙ্গল হ'ল' শিরোনামে। সেখানে তিনি দেখেছিলেন, একটি কালো বিড়াল রাস্তা পার হয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ায় কলেজ ফেরত মেয়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে। এমনকি তিনি জায়গাটা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এলেও ওই শিক্ষিত মেয়েরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েই ছিল। প্রতিবেদনের শেষে তাঁর প্রশ্ন ছিল 'এই সঙ্কীর্ণতা থেকে আধুনিক মানুষ কবে মুক্ত হবে?' প্রসঙ্গত বলা যায়, ২০১৮তে আন্তর্জালে এই যে বিড়াল নিয়ে কিছু লেখালিখি তার পেছনে আছে 'আন্তর্জাতিক বিড়াল দিবস' পালনের উপলক্ষ। বন্যপ্রাণী কল্যাণ আন্তর্রাষ্ট্র পুঁজি (International Fund for Animal Welfare) ২০০২ সাল থেকে ৮ আগস্টের দিনটি বিড়াল দিবস হিসাবে পালন করে আসছেন।

যাইহোক, এই আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম, সোনা-রূপার বিড়াল সম্ভবত আহোম রাজবংশ বা চুটীয়া রাজবংশের বংশানুক্রমিক মঙ্গলচিহ্ন ছিল। এর আগে কামরূপ বলি বা প্রাগজ্যোতিষপুর, যে রাজবংশই (অসুর হোক, বর্মন

হোক বা পাল হোক) এখানে রাজত্ব করুক না কেন, কেউই এমন কোনো মঙ্গলচিহ্ন বহন করে চলেছিলেন কি না, তা জানা যায় না। তাই আমাদের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে চুটীয়া এবং আহোম রাজাদের সংঘাতের কাল থেকে – কারণ সেটা অসমীয়া 'বুরঞ্জী' লেখার কাল, আর সেখানেই সোনার বিড়ালের প্রসঙ্গ প্রথম দেখতে পাওয়া যায় এবং এটাকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'টোটেম' রূপে শনাক্ত করা যায়। কছারি, বোড়ো, কার্বি, ডিমাসা ইত্যাদি ইন্দোমঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতিতে হয়তো একই ভাবে বিড়াল 'টোটেম' হিসাবে উদ্ভুত হয়েছিল। কারণ বিড়ালকে না মারা এবং কোনোভাবে মেরে ফেললে সোনারূপার বিড়াল দেবতার কাছে উৎসর্গ করা এই 'কিরাত' বা কছারি (ইন্দো-মোঙ্গলীয়) জনগোষ্ঠীর বংশগত শুভাশুভ ধারণার অন্তর্গত। আহোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর সুবৃহৎ অসমীয়া সমাজ গড়ে ওঠার কালেও বিড়াল কিন্তু এই সাযুজ্যের জন্যই লোকসংস্কৃতির প্রধান 'মোটিফ' হিসাবে তার স্থান ধরে রেখেছিল। আর 'সোনার বিড়াল' টোটেম-এর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বিড়াল সম্বন্ধীয় যাবতীয় 'ট্যাবু'রও পথ চলা শুরু হয়েছিল নিশ্চয়ই সেই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভেতরেই। সেখানে যোগাত্মক ট্যাবু (positive taboo) আর ঋণাত্মক ট্যাবু (restrictive taboo) দুটোই ছিল। কিন্তু লোকসংস্কৃতির নিয়ম মেনেই কালক্রমে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা এবং অন্য জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাবে অসমীয়া জনজীবনে বিড়াল মোটিফ হিসাবে বজায় থাকলেও যোগাত্মক ট্যাবুগুলো অন্তর্হিত হয়েছে আর অন্য গোষ্ঠীর সমধর্মী লোকবিশ্বাসের প্রভাবে ঋণাত্মক ট্যাবুগুলোই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। নিচের ছবিটা বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে পারে, - মনে করা যাক 'ক' এবং 'খ' দুটো জনগোষ্ঠী আছে, আলাদা ভাবে তাদের টোটেম এবং নির্দিষ্ট লোকবিশ্বাস যুক্ত ট্যাবুও আছে, -

'ক' জনগোষ্ঠী	'চ' টোটেম	'ট' ১ লোকবিশ্বাস
		'ট' ২ লোকবিশ্বাস
		'ট' ৩ লোকবিশ্বাস
'খ' জনগোষ্ঠী	'ছ' টোটেম	'ঠ' ১ লোকবিশ্বাস
		'ঠ' ২ লোকবিশ্বাস
		'ঠ' ৩ লোকবিশ্বাস

এখন কালক্রমে 'ক' ও 'খ' জনগোষ্ঠী দুটর মধ্যে কোনোকালে বিরোধ বা সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলে সমধর্মী বা সমরূপ যোগাত্মক লোকবিশ্বাসগুলো ক্রমে হারিয়ে গিয়ে ঋণাত্মক বা Restrictive লোকবিশ্বাসগুলোই (folk-belief) প্রাধান্য লাভ করে। হয়তো দেখা গেল 'ট' ১ ও ২ 'ঠ' ২ ও ৩ এর সমধর্মী যোগাত্মক (Positive) ট্যাবু। ফলে সম্প্রীতি বা বিরোধিতার সম্পর্কে 'ক' জনগোষ্ঠীতে 'ট' ৩ এবং 'ঠ' ১ ঋণাত্মক লোকবিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গেল। সেই সূত্রেই সচরাচর আমরা নিষেধাত্মক ট্যাবু নিয়েই অসমীয়া সাহিত্যে সমাজে বিড়ালের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। যেমন, একটু আগেই সুশান্তকৃষ্ণ শর্মার প্রতিবেদনে দেখেছি বিড়ালের রাস্তা কাটা ও কলেজ-যাত্রী ছাত্রীদের ভয় ও আশঙ্কার ছবি, যেন তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটবে। তেমনই অপু ভরদ্বাজের গল্প বা প্রবীণা শইকীয়ার গল্পে মায়াবী আর অশুভ সংকেতময় কালো বিড়াল। আবার দৈনন্দিন ভাবনায় বিড়াল সম্পর্কীয় ঋণাত্মক ট্যাবুকে লোকপ্রচলন হিসাবে স্মরণ করেছেন মাধুরী দেবী অথবা রশিদা রহমান তাঁদের বক্তব্যে। বোড়ো, রাভা, কছারিদের জনজাতীয় কথাতেও বিড়াল ঋণাত্মক ট্যাবু। এমনকি 'সাধুকথা', 'ফকরা যোজনা' এবং ঈশপ বা পঞ্চতন্ত্রের কিছু জনপ্রিয় কাহিনীতে, মেকুরীকণীয়া-মেকুরীখুজিয়া-মেকুরীখোজ ইত্যাদি প্রচলিত শব্দে আর 'বিড়ালী ব্রত', 'ভিজা মেকুরী'র মতো নানা প্রবচন বাক্যে ওই ঋণাত্মক ট্যাবুরই প্রাধান্য। আর আছে লোকবিশ্বাস – সেখানেও ঋণাত্মক ট্যাবুর বাড়বাড়ন্ত। যোগাত্মক ট্যাবু রয়ে গেছে 'সাথ বরত', লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'মেকুরীর জিয়েকর সাধু'র মতো কয়েকটি নীতিকথামূলক লেখায় এবং ঘরে অতিথি আসা সম্পর্কিত দু-একটি লোকবিশ্বাসে।

এটা কবে হয়েছে বা কীভাবে হয়েছে তা নির্দিষ্ট ভাবে বলাটা অসম্ভব। তবে এর পেছনে সমাজ-সংগঠনের যে ইতিবৃত্ত থাকে তার অনুসন্ধান আকর্ষণীয় হতে বাধ্য। আমরা সহজেই বিড়াল তপস্বীকে, ভেজা বিড়ালকে শুধু অসম নয়, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেই খুঁজে পেতে পারি। কালো বিড়ালে অশুভ আত্মা বা ডাইনি ভর করে এই বিশ্বাস থেকে যে ভয়ের

উৎপত্তি এবং তার প্রতিফলন যে ঋণাত্মক ট্যাবু সেটাতো শুধু অসম বা ভারতবর্ষ নয়, আমরা তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ইজিপ্টে পৌঁছেও তাকে খুঁজে পাবো। ষোড়শ শতক থেকে বিভিন্ন পাশ্চাত্য উপকথায় বিড়াল সম্পর্কে মানুষের এই বিশ্বাস একটা রূপ পেতে শুরু করে। আবার ভারতীয় জ্যোতিষচর্চায় রাহু অশুভ গ্রহ আর কালো বিড়াল সেই রাহুর বাহন। আমরা তো জানি, প্রাগজ্যোতিষপুর ছিল ভারতীয় জ্যোতিষচর্চার অন্যতম কেন্দ্র। যখন প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষে জ্যোতিষের চর্চা হত তখন কি 'কালো বিড়াল' লোকচেতনার বাইরের কোনো প্রাণি ছিল? অথবা তন্ত্রচর্চার কেন্দ্র কামরূপ কামাখ্যা? এখনও গুয়াহাটির কাছাকাছি আজারা অঞ্চলে 'প্রেতবিদ্যা' (Demonology) সম্পর্কে প্রচলিত লোকবিশ্বাসে 'কালো বিড়াল' ঋণাত্মক ট্যাবু নিয়েই উপস্থিত। কামরূপ বা অসমের অন্যত্রও এই ধরনের প্রচলিত লোকবিশ্বাস বিদ্যায়তনিক চর্চায় ধরাও পড়েছে।[২১] তাহলে কি সেই 'প্রাচীন' কালেই বিড়াল এতদঞ্চলে 'টোটেম' সত্তা গড়ে তুলেছিল? তখনই কি উদ্ভব হয়েছিল এই টোটেম সম্পর্কিত কিছু যোগাত্মক ট্যাবুর সঙ্গে ঋণাত্মক ট্যাবুগুলোর? কোনো বিশেষ ক্রিয়াচারে অশুভ বা নিষেধাত্মক সত্তাটিই কি ক্রমবিলীয়মানতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল? যুগে যুগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কি অসমে সেই উত্তরাধিকারকেই বয়ে নিয়ে চলেছে? হয়তো সেই প্রাচীনকাল থেকেই একাধিক নৃগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাসের বিরোধ বা সম্প্রীতিমূলক সম্মিলনে ট্যাবুগুলো নানা রূপে সমাজদেহে অবস্থান করছে এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে! হয়তো কোনো সন্ধানী দৃষ্টির কাছে ধরা পড়বে সেই অকথিত বিড়াল বা 'মেকুরী' রহস্য। অথবা অসমের লোকঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত বিড়াল সম্পৃক্ত লোককাহিনি, প্রবচন ইত্যাদির অবয়ববাদী বিশ্লেষণ আমাদের কাছে এনে দেবে নতুন কোনো ভাবনা-প্রস্থান। তবে অসমীয়া পল্লী এবং পৌর জনজীবনে বিড়াল যে এক দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধ্বজাবাহক, আপাতত এই তাৎপর্যে এসে আমরা ইতি টানতে পারি।

Reference:

১. সদরামিন, হরকান্ত বরুয়া, (১৯৯০) সূর্যকুমার ভুঞা (সম্পা.), 'অসম বুরঞ্জী', বুরঞ্জী আরু পুরাতত্ত্ব বিভাগ, পৃ. ২৩
২. চতুর্দশ শতকে চুটীয়া রাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল বর্তমান শদিয়া থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশ সংলগ্ন অঞ্চল পর্যন্ত। এখনকার
লখিমপুর, ধেমাজি, তিনসুকিয়া এবং ডিব্রুগড়ের কিছু অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানীর নাম ছিল সধয়াপুর, রাজাদের অধিষ্ঠান ছিল কুণ্ডিলনগরে। রাজা নন্দীশ্বর থেকে ধীরনারায়ণ পর্যন্ত রাজবংশের কথা জানা যায়। রাজবংশের সৌভাগ্য-সম্পদ এবং উত্তরাধিকার হিসাবে ছিল সোনা ও রূপার বিড়াল, সোনা ও রূপার দন্ড-ছত্র আর সোনা ও রূপার 'চাল-পীরা' বা জলচৌকি।
৩. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪
৪. ভুঞা, সূর্যকুমার, (সম্পা.), (২০১৪) সাতসরী 'অসম বুরঞ্জী', দ্বিতীয় প্রকাশ, মণিমাণিক, গুয়াহাটি, পৃ. ৪৭-৪৮
৫. তদেব, পৃ. ৩২
৫. ক. চুটীয়া জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতি আরু ইতিহাস, https://m.facebook.com>chutiatribe, ১২.১২.২০১৮
৬. শর্মা, নবীন চন্দ্র, (২০০৩), 'Ritual Tales of Assamese Women', লোকসংস্কৃতি গবেষণা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৭
৭. তদেব, পৃ. ৪২-৪৩
৮. বরুয়া, প্রফুল্ল চন্দ্র, (সম্পা.), (১৯৬২), অসমীয়া প্রবচন, অসম পাব্লিকেশন বোর্ড, গুয়াহাটি
৯. ওই
১০. অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, (২০২১), ই-ম্যাগাজিন সংখ্যা, ২২ অগাস্ট
১০. ক. গগৈ, মাধুরী, অসমিয়াত কথাবতরা,
https://en.gb.facebook.com/groups/axomiyakothabotora/permalink, ০২-১০-২০১৮

১০. খ. ইসলাম, শেখ মকবুল, (২০১১) 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৩৪

১১. অসমীয়া 'সাধুকথা' সন্ত-সাধুর উক্তি বা সত্য কথা বলে দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত হয়ে আসছে। এগুলো উপদেশ বা নীতিকথামূলক। বাংলার রূপকথার সঙ্গে এর যোগাযোগ নেই। বরং একে লোককথা বলা যেতে পারে।

১২. ভুঞা, মাধন, (২০১৯), 'জোনবাইর দেশর সাধু', পুরনিগুদাম শতদল শাখা সাহিত্য সভা, নগাঁও

১৩. বরা, রত্নেশ্বর, (২০২১), 'মইনাহঁতলৈ মজা মজা সাধুকথা', কৌস্তুভ প্রকাশনী, ডিব্রুগড়

১৪. 'তেনালীরামর সাধু', Storiesworld.in, translated by STORIESWORLD789

১৫. অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জিলার রাভা জনগোষ্ঠীর লোককথা, 'বাঘ আরু মেকুরীর খরিয়াল', ৭ম শ্রেণির অসমীয়া ভাষা পাঠ ১৪, শঙ্করদেব শিশু বিদ্যা নিকেতন, গুয়াহাটি।

১৬. বিঐতে উপজাতিদের এই লোককথাটি সংগ্রহ করেছেন প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রবক্তা ড০ অভিজিৎ দত্ত।

১৭. বরা, দিলীপ, (২০১৪), 'সধয়াপুরর সোনর মেকুরী', এপোকাস, কটন কলেজ, গুয়াহাটি

১৮. ভরালি, বিভা : 'প্রবীণা শইকীয়ার চুটিগল্প', অপূর্ব বরা (সম্পা.), (২০১২), 'অসমীয়া চুটিগল্প : ঐতিহ্য আরু বিবর্তন', যোরহাট

১৯. ভরদ্বাজ, অপু, (২০২১), 'আজি গল্প ক'ম', আঁকবাঁক, গুয়াহাটি

২০. পূর্বোল্লিখিত, 'অসমীয়াত কথাবতরা' ফেসবুক পাতা।

২১. Dutta, Dr. Avijit Kumar, 'Folk Beliefs of Fishing Communities: A Case Study in Kamrup District', (2014), PhD Thesis guided by Dr. Sanjay De, Dept of Folklore Research, Gauhati University.